OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 410 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 410 - 415
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

স্মৃতিকথার আলোকে রবীন্দ্র-চিত্রকলা

চন্দ্রাণী রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: croy25682977@gmail.com
009-0003-2789-8527

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Rabindranath Tagore, Smritikatha, Rabindranath Chitrakala, Alapchari Rabindranath, Shilpi Rabindranath, Chobi o Rabindranath, Kalabidya o Rabindranath, Artist Rabindranath.

Abstract
Poetry and paintings are originated from the same source, the human heart, in nature. Creation of poetry throughout his life led to the accumulation of countless images in the treasure of Rabindranath Tagore's mind. His writings and drawings combined to create a new design through the process of editing. In fact, one day his writing and editing game knocked on the door of the world of painting. As he reached the twilight of his life, it was as if a flood of painting came down from the treasury of his mind to the tip of his brush. We find many theoretical discussions about Rabindranath's paintings. However, we can learn about the essence of his paintings from the memoirs of several people who came close to Rabindranath. Nowhere else is Rabindranath's own thoughts on images as clear as they are in these memoirs. One such invaluable book about Rabindranath's own thoughts on painting is Rani Chanda's 'Alapchari Rabindranath'. During the last few years of Rabindranath Tagore's life, Rani Chanda became his devoted companion in his artistic practice. Rabindranath Tagore has a long history of artistic practice. In addition to discussing that history, I would also try to clarify the psychology of Rabindranath regarding painting in this discussion. Towards the end of his life, he painted as he pleased. Yet, he remained uncertain about the creation through the brush until his last days. Rabindranath himself began painting in that sense when he was about sixty-five years old. Rabindranath approached painting like a small boy without any restraints. He painted according to his own whims, going against conventional ideas. The creation of images was hidden in his mind, under the guise of playing with his own pleasure. We know that the Creator, inspired by the inspiration of creation, he creates in the joy of his own mind - He had no idea how great his creations were. Rabindranath Tagore was as like as conventional painters. The books of memoirs are unique evidence of that.

Discussion

চিত্রের আবেদন চিত্তের কাছে। যথার্থ শিল্পীর হাতের সার্থক ছবি সংবেদনশীল দর্শকের অনুভবকে আবিষ্ট করে তোলে। গ্রীক কবি Simonides ছবিকে বলেছিলেন, ‘a silent poetry’।[১] ছবি চলে তার আপন ছন্দে, অর্থ বোঝাবার দায় সে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 410 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নেয়নি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাও তেমনই অর্থবোধক নয়, তা উপলব্ধির বিষয়। কোনো বিশেষ দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করার জন্য ছবি আঁকতে শুরু করেননি রবীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের জীবনে ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন নিতান্ত খেলার ছলে, ইচ্ছেমত। ১৯২৪ সালে থেকে তিনি কলমের মুখ দিয়ে রেখাঙ্কন শুরু করেন। ক্রমে তাঁর লেখার সঙ্গে আঁকার খেলা মিশে কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে তৈরী হয় নতুন নক্‌শার আলপনা। বস্তুত এমন করেই তাঁর লেখা-কাটাকুটির খেলা একদিন চিত্র জগতের দ্বারে এসে ঘা দিল। খুব সচেতনভাবে শুরু না হলেও রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোধূলিলগ্নে পৌঁছে যেন তুলির অগ্রে মনের ভাণ্ডার থেকে নেমে এল চিত্রসৃষ্টির ঢল। তাই বুঝি তিনি বলেছেন, ছবি হল তাঁর শেষ বয়সের প্রিয়া। রবীন্দ্র-চিত্রকলা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে আসা বেশ কিছু মানুষের স্মৃতিকথায় আমরা জানতে পারি তাঁর চিত্রসৃষ্টির আঁতের কথা।

রবীন্দ্রনাথ একদিনেই হঠাৎ করে চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠেননি। তাঁর চিত্রশিল্পচর্চার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রথমে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই রবীন্দ্রমানসে চিত্রকলাবিদ্যার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক’ গ্রন্থের ২য় খন্ডে জানান, ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রথম পর্যায়ে সুরেন্দ্রনাথ কর রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই বালকদের চিত্রবিদ্যা শেখাতেন। এরপর ১৯১৯ সালে যখন বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা হচ্ছে তখন থেকেই একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে কলাভবনের পরিকল্পনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এসময়েই নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদারের মত শিল্পীরা শান্তিনিকেতনে যোগদান করছেন। ছাত্রদের হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির জন্য কলাবিদ্যার শিক্ষা আবশ্যক বলে সে সময়ে মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৯ সালে পূজোর ছুটির পর বিদ্যালয় খুললে রবীন্দ্রনাথ কলাবিদ্যা সম্পর্কে নতুন বাণী ঘোষণা করেন—

> “সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থায় এই কলাবিদ্যার কোনো স্থান নাই। কলাবিদ্যা শিক্ষার বিরুদ্ধে দেশের লোকের যুক্তি যে ইহা জাতিকে দুর্বল করে।”[২]

একথা যে সর্বৈব ভুল তা প্রমাণ করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন—

> “বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমদের সঙ্কল্প হউক।”[৩]

এইভাবেই গুরুদেবের আগ্রহেই কলাভবন সৃষ্টির ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা হয়।

এরপর ১৯২৪ সালে দক্ষিন আমেরিকার স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের পেরু যাবার নিমন্ত্রণ আসে। কিন্তু সেবার জাহাজেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এ সময়ই (১৯২৪, ১২-ই নভেম্বর) ঘটনাচক্রে তিনি আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়নোস এয়ারেস শহরের নিকটে সান ইসিদ্রোয় ‘মিরালরিও’ নামে একটি বাড়িতে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কাছে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ‘মিরালরিও’ শব্দের অর্থ ‘স্রোতস্বিনীকে দেখা’। নামের সার্থকতা বজায় রেখে এ বাড়ির সম্মুখ দিয়েই বয়ে চলত স্রোতস্বিনী প্লাতা নদী। এ সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ ‘পুরবী’র কবিতা রচনা শুরু করেন। এই ‘পুরবী’ লেখা সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা আরম্ভ। পরবর্তীতে এই ‘পুরবী’ কাব্যগ্রন্থই ‘বিজয়া’ অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথ। টেবিলে পড়ে থাকা কবিতার খাতা হাতে তুলে নিয়ে ওকাম্পোই প্রথম অনুভব করেন তাঁর লেখার মাঝে নানা কাটাকুটিকে জুড়ে দিলে তা যেন এক-একটা আকার লাভ করত। সমীর সেনগুপ্তের ‘রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশীরা’ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি ওকাম্পো তাঁর স্মৃতিকথা (‘তাগোর এনলাস বার-রান-কাস দে সান ইসিদ্রো’, যা মূলত স্প্যানিশ ভাষায় লেখা)-তে বলেছেন—

> “এই খাতা আমায় বিস্মিত করল, মুগ্ধ করল। লেখার নানা কাটাকুটিকে একত্র জুড়ে দিয়ে তার উপর কলমের আঁচড় কাটতে যেন মজা পেতেন কবি। এই আঁকিবুঁকি থেকে বেরিয়ে আসত সব রকমের মুখ, প্রাগৈতিহাসিক দানব, সরীসৃপ অথবা নানা আবোলতাবোল। সমস্ত ভুল, সমস্ত বাতিল করা লাইন, কবিতা থেকে বহিষ্কৃত সবশব্দ এমনি করে পুনর্জীবিত হত এক রূপের জগতে, আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 410 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> স্নিগ্ধ কৌতুকে হাসত তারা, নয়তো তাকিয়ে থাকত একটু বাঁকা মুখে, মেলে ধরত যেন কোনো অজানা প্রাণীর ভয়ংকর দৃষ্টি।”[৪]

এই ছোট খাতাটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের শিল্পী হয়ে ওঠার সূচনাপর্ব।

চিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনার তেমনই আর এক অমূল্য গ্রন্থ রানী চন্দের ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ’। এই গ্রন্থের তাৎপর্য হল এখানে রবীন্দ্রনাথের আঁকার ধরনের পাশাপাশি চিত্রকলা নিয়ে তাঁর মনস্তত্ত্বের জায়গাটিও স্পষ্ট হচ্ছে নির্দিষ্ট সাল-তারিখের কাঠামোতে। এই গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের সময়কাল ৭ জুলাই ১৯৩৪ থেকে ১২ জুলাই ১৯৪১, প্রায় সাত বছর। এই সময়পর্বের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথনের ভঙ্গিতে নানা বিষয়ের পাশাপাশি চিত্রকলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার জগত আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ছবি আঁকা শুরু করলেও অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদারের মত বহুশিল্পীকেই উৎসাহ দিয়েছিলেন অনেক আগে থেকেই। কারোর মধ্যে কোনো প্রতিভার বীজ লুকানো আছে দেখলেই তিনি স্বয়ং প্রেরণা দিতেন তাঁকে। সেই অনুসারেই চলত তাঁদের প্রশিক্ষণ।

তেমনই বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মুকুল দে-র বোন রানী যখন বিক্রমপুর থেকে প্রথম শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, তখনই ছবির প্রতি তাঁর ঝোঁক লক্ষ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই গুরুদেবের নির্দেশেই রানী পাশের পড়া থেকে মুখ ফিরিয়ে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন চিত্রশিল্পের প্রতি। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে রানী চন্দই হয়ে ওঠেন তাঁর চিত্রশিল্প চর্চার একনিষ্ঠ সাথী। তিনি রবীন্দ্রনাথের হাতের কাছে কখনও রঙ জুগিয়েছেন, পেন্সিল কেটে কেটে দিয়েছেন, কখনও আবার নিজেই হয়ে উঠেছেন তাঁর পোট্রেটের মডেল। রানী চন্দের লেখা ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে সেই সব দিনের ছবি যেন স্তরে-স্তরে সাজানো আছে।

ছিন্নপত্রে ১৮৯৩ সালের ১৭ই জুলাই ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

> “ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত ক’রে থাকি - কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চ’লে গেছে।”[৫]

তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি একথা বললেও চিত্রবিদ্যার প্রসন্নতা লাভ করবার সুপ্ত বাসনাটি তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। সারাজীবন অসংখ্য কাজের জালে নিজেকে জড়িয়ে শেষ বয়সে যেন ছবিকে আঁকড়ে ধরে বিশ্রাম নিতে চেয়েছেন তিনি। এ যেন তাঁর অবসর যাপন। সেই প্রসঙ্গেই তিনি ১৯৩৯ সালের ১ জুলাই রানী চন্দ-কে বলছেন—

> “এবারে দেখি, বসব আর-একবার, নিজের খেয়ালমত ছবি আঁকব। অবসর পাই না রে। কাজ আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, তাকে ছাড়াতে পারি নে। একটা ছাড়াই তো আর-একটা আসে। অবসর নেই, অবসর নিতেও পারি নে।”[৬]

জীবনের শেষ বেলায় পৌঁছে তিনি মনের খেয়ালে ছবি এঁকেছেন। তবু তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর মনে দ্বিধা থেকে গেছে শেষদিন পর্যন্ত। মৃত্যুর ঠিক এক মাস পূর্বেও এই দ্বন্দ্ব কাটছে না। ১৯৪১ সালের ৮ জুলাই তিনি বলছেন—

> “এ ভালো লাগে কি লাগে না আমি বলতে পারি নে। আমার কাব্য কিংবা গল্প - এ আমি জানি। কিন্তু আমার ছবি ভালো কি মন্দ আমি বুঝতে পারি নে।”[৭]

তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কখনওই আর্টিস্ট বলে মানতে চাইছেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এসে সেই অর্থে ছবি আঁকা শুরু করছেন। রবীন্দ্রনাথ ছবির কাছে এসে বাঁধনছাড়া ছোট ছেলের মতো আচরণ করেছেন। এঁকেছেন নিজের খেয়ালে প্রথাগত ধারনার বিপরীতে গিয়ে। যখন সাধারন লোকে তাঁর ছবি বুঝতে পারেননি তখন তিনি খুশি হয়েছেন। তখনই বরং উদ্বিগ্ন হয়েছেন যখন সবাই সুন্দর বলেছে। তৎক্ষণাৎ খানিকটা কালি ঢেলে বা এলোমেলো আঁচড় কেটে নষ্ট করে দিয়েছেন সেই ছবি। কিন্তু যখন তিনি দেখেন শিশু বিভাগের ছোটো ছেলেরাও কেমন সুন্দর ছবি আঁকে তখন আক্ষেপ করে বলেন তাঁর ছেলেবেলায়ও যদি তিনি ছবি আঁকার এমন অনুকুল আবহাওয়া পেতেন তবে তিনিও একজন আর্টিস্ট হতে পারতেন। তাঁর মনের অগোচরে আপন আনন্দের খেয়ালে খেলার ছলে চিত্রের সৃজন। ১০ জানুয়ারী ১৯৪১ সেই বিষয়ে তিনি গ্রন্থকারকে বলছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 410 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "এ কি আর ছবি-আঁকা। পথ চলতে চলতে সব ছড়িয়ে যাওয়া - এসব উচ্ছিষ্ট। আমি যদি সত্যিই আর্টিস্ট হতুম, তবে দিনরাত ঐ নিয়েই পড়ে থাকতুম।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা বা গানের বিষয়ে যতটা প্রত্যয় রাখছেন, ছবির বিষয়ে কোনোদিনই সেই বিশ্বাসটা রাখছেন না বরং তাঁর ছবির সমাদর হলে তিনি বারবার বিস্মিতই হচ্ছেন। ৪ জুলাই ১৯৪১ রানী চন্দ-কে তিনি বলছেন—

> "...যেমন আমার ছবি আঁকা। আমি তাঁর হঠাৎ আনাগোনা বুঝতেই পারি নে। লোকে যখন আদর করে - আমার অবাক লাগে।"[৯]

এই একই অনুভব সমসাময়িক সময়ে আর একটি পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৪১ সালের ২৫শে মে তিনি যামিনী রায়কে লিখছেন—

> "যখন প্যারিসের আর্টিস্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোনখানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধ করি শেষ পর্যন্তই তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা দূর হবে না।"[১০]

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, সমীর সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশীরা' গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে যান তাঁর আঁকা প্রায় চারশোটি ছবি নিয়ে। ইচ্ছে ছিল প্যারিসে প্রদর্শনী করবেন। এই সময় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সহায়তায় ১৯৩০ সালের ২রা মে প্যারিসের 'ত্রেয়াতর পিগাল' (Treateur Pigalle) গ্যালারিতে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের কিছুদিন পূর্বেই তাঁর ছবির প্রদর্শনী খোলা হয়। ১২৫টি ছবির প্রদর্শনী হয় এখানে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে সে সময়ের ছবি ধরা পড়ে—

> "১৯৩০-এ বাবা আবার যখন প্যারিসে যান, সঙ্গে ছিল তাঁর আঁকা কিছু ছবি। ছবি দেখে কয়েকজন ফরাসি শিল্পী বাবাকে একটা চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, চট করে প্যারিস সহরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অসম্ভব বললেই হয়। মোটামুটি পছন্দসই একটা হল পেতে হলে বছরখানেক আগে থেকে চেষ্টা-চরিত্র করতে হয়। বাবা সেনিওরা ওকাম্পোকে তারযোগে অনুরোধ জানালেন তিনি এসে যেন বাবার সহায় হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে এলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হল যেন বিনা আয়াসেই প্রদর্শনীর সব রকম ব্যবস্থা তাঁর সাহায্যে হয়ে গেল।"[১১]

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে বলেছেন—

> "পারিস্, সভ্যতার রাজধানী পারিস্, রঙ্গ ঢঙ্গ ভোগ বিলাসের ভূস্বর্গ পারিস্, বিদ্যা শিল্পের কেন্দ্র পারিস..."।[১২]

সেখান থেকে কোনো ছবি মর্যাদা পেলে তা বিশ্বের দরবারে গ্রহণীয় হবেই, তাই কি রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর ছবির প্রথম প্রদর্শনীটি বিদেশের মাটিতেই হোক? নাকি ভারতবাসীরা তাঁর ছবি বুঝতেই পারবেন না, সেই আশঙ্কা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন প্যারিসে চিত্র প্রদর্শনীর কথা? কারণ শেষ বয়সেও (১৯৪১, ২৬ মে) তিনি রানী চন্দকে বলছেন- আমাদের দেশে এখনও ছবি দেখবার সেই বোধ তৈরি হয়নি, 'ছবির জন্য এখনো অনেক সবুর করতে হবে আমাদের।'[১৩] মৃত্যুর দু'মাস আগেও যদি এমন পরিস্থিতি হয় তবে দশ বছর আগে তাঁর ছবি অনুভব করবার সেই বোধই মানুষের মধ্যে হয়তো ছিল না বলে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

নিজের আঁকা ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা সংকোচ থাকলেও আর্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বরাবরই যথেষ্ট সচেতন। এমনকি লেখিকার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেশী ও বিদেশী ছবির মূল তফাতের জায়গাটিও তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কালচারের মেলবন্ধনের পীঠস্থান ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। তাই শিল্পের প্রতি সচেতনতা তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তা মূলত একটা ইউনিভার্সাল ব্যাপার। একই বিষয়কে কেন্দ্র করে দুটি দেশের দুটি ছবির মধ্যেও মূল রস একই থাকে। সেখানে কোনো জাতিভেদ বা ভাষার তফাত নেই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 410 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারছি এই সময়ে (১৯৩৯, ৪ মার্চ) রবীন্দ্রনাথ চোখের অসুখে ভুগছেন। তাই রানী চন্দ দিনে তিন-চারবার চোখে ওষুধ দিতে আসতেন। তীব্র জ্বালায় ঝরঝর করে জল পড়ত তাঁর চোখ দিয়ে। ডা. নৃপেন ভৌমিক তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যভাবনা' গ্রন্থে বলছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বর্ণান্ধ ছিলেন। লাল রঙ এবং সবুজ রঙ তিনি আর পাঁচজন সাধারন মানুষের মতো দেখতে পেতেন না। ডাক্তারি পরিভাষায় লাল রঙ দেখার অক্ষমতাকে বলা হয় প্রোটানোপিয়া এবং সবুজ রঙ দেখার অক্ষমতাকে বলা হয় ডিউটারঅ্যানোপিয়া। বর্নান্ধতা প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের শরীরে থাকা এক ধরনের সংবেদনশীল কোষের মধ্যে দিয়ে তিনটি রঙ আমাদের চেতনায় প্রতীত হয়। অন্যান্য সমস্ত রঙ লাল-সবুজ ও নীল এই তিনটি রঙের সংমিশ্রণে অনুভূত হয়।

'The appreciation of colours is a function of the cones.' Young - Helmholtz-এর তত্ত্ব অনুযায়ী—

> "Three types of colour receptors. Although each receptor is assumes to all wavelengths, they have different spectral sensitivities, so that one is more sensitive to long wavelengths (reds), one to medium wavelengths (greens) and one to short wavelengths (blues). All other colours are assumed to be perceived by combinations of these so that the perception of yellow, for example, is characterized as being due to the simultaneous stimulation of red and green receptors and their integration in the visual neural pathways and the visual cortex."[১৪]

এটি মূলত একটি জিনবাহী রোগ। মহিলারা এটিকে বহন করলেও, পুরুষেরাই এতে বেশী আক্রান্ত হয়।

> "This may be congenital or acquired. Acquired colour blindness may be partial...or complete…. Congenital colour blindness occurs in two chief forms - tolal and partial. The former is very rare. Colour blindness is an inherited condition, being transmitted as X-linked recessive through the female who is usually unaffected, and is probably due to the absence of one of the photopigments normally found in the foveal cones. In most cases reds and greens are confused."[১৫]

লাল ও সবুজ রঙ আর পাঁচটা সাধারন মানুষের চোখে যেভাবে ধরা পড়ত রবীন্দ্রনাথ ঠিক তেমনটি দেখতেন না। এই প্রসঙ্গে 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। রানী চন্দ বলছেন—

> "ছবির সূচনা দেখেই আমি সেই সেই শিশি হাতের কাছে রেখে অন্য শিশিগুলো দূরে সরিয়ে রাখতুম। কখনো বা হলদে আকাশের জন্য রঙ নিতে গিয়ে কালোর শিশিতে তুলি ডোবাতে যাবেন, তাড়াতাড়ি হলদে শিশি এগিয়ে দিতুম। তিনি হেসে উঠতেন, বলতেন— দেখলি, আর-একটু হলেই সর্বনাশ হত।"[১৬]

এই ভুল কি কেবলই অসাবধানতাবশত নাকি বর্ণান্ধতাই এর কারণ? কারণ হলুদ রঙ অনুভূত হয় লাল ও সবুজের মিশ্রণে। লাল ও সবুজ বর্ণান্ধতার কারনেই হয়তো কখনও কখনও হলুদ রঙ চিনতে ভুল হয়ে যেত।

এ সমস্যার ইঙ্গিত ছিল ১৯০০ সালের ৬-ই মার্চ রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর একটি পত্রে। সেখানে জগদীশচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথকে 'slightly green-blind'[১৭] বলে উল্লেখ করেছেন। জীবনের শেষদিকে দৃষ্টিশক্তি আরো কমে যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর এই প্রোটানোপিয়া তাঁর প্রতিভার স্ফুরণে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। এই কারনেই বোধহয় মনোক্রোম ছবির প্রতি তাঁর এত আকর্ষণ ছিল। ১৯৩৪ সালের ৮ জুলাই রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> "ছবিতে আমার একটা বেশ মজা আছে। আমি তো ছবিতে একই বারে রঙ দিই না। আগে পেনসিল দিয়ে ঘষে ঘষে একটা রঙ তৈরি করি মানানসই করে, তার পরে তার উপরে রঙ চাপাই। তাতে করে হয় কী - রঙটা বেশ একটু জোরালো হয়।"[১৮]

সব রঙের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল নীল রঙ। রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও এই নীলের ব্যবহারাধিক্য দেখা যায়। বহু তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি স্মৃতিকথাগুলির পাতা ঘেঁটে দেখলে এক রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রসঙ্গে এক নতুন জগত আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। স্রষ্টা সৃষ্টির প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপন মনের আনন্দে সৃজন করে যান - সে সৃষ্টি যে কত বড়দরের, সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো খেয়ালই থাকে না। রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 410 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কালের যাত্রায় সাহিত্য সেকেলে হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ছবি নিত্যই নূতন। কালের প্রভেদ, ভাষার ব্যবধানের সীমা অতিক্রম করে তার আবেদন মানুষের অনুভবের কাছে। রবীন্দ্রনাথের ছবিও তেমনই সার্বজনীনতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। চিত্র যেন তাঁর জীবন দর্শনের আরেক রূপ। নষ্ট হওয়া ছবি থেকে যেমন আবার নতুন কোনো রূপ সৃষ্টি হয়, তেমনি শেষ জীবনে নানা জীর্ণতা, অসুস্থতার মধ্যেও তিনি নিজেকে বারবার নব সৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। সব শেষ হয়ে যাওয়া কেবল শেষ হওয়াই নয় নতুন কিছুর সুচনাও - রবীন্দ্র-জীবন ও চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এ এক অমোঘ সত্য।

Reference:

১.https://en.wikipedia.org/wiki/Ut_pictura_poesis#:~:text=Some%20centuries%20before%2C%20Simonides%20of,claim%20has%20attracted%20spirited%20dispute.
২. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, ‘রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক’ ২য় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, ১৯৩৬, পৃ. ১৬৪-১৬৫
৩. তদেব, পৃ. ১৬৫
৪. সেনগুপ্ত সমীর, ‘রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশীরা’, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১১, পৃ. ১৬২
৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘আছে আমার ছবি’, সম্পা: ভট্টাচার্য সন্দীপন, মনফকিরা, কলকাতা- ৭০০০৯৯, ২০১৭, পৃ. ৭
৬. চন্দ রানী, ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ,’ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ-২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯, পৃ. ৬২
৭. তদেব, পৃ. ১৬৪
৮. তদেব, পৃ. ৭৮
৯. তদেব, পৃ. ১৫৪
১০. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘আছে আমার ছবি’, সম্পা: ভট্টাচার্য সন্দীপন, মনফকিরা, কলকাতা- ৭০০০৯৯, ২০১৭, পৃ. ৭৪
১১. ঠাকুর রথীন্দ্রনাথ ‘পিতৃস্মৃতি’, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন (প্রা.) লিমিটেড, ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩, পৃ. ১৯৪
১২. বিবেকানন্দ স্বামী, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ৩য় সংস্করণ, জৈষ্ঠ্য, ১৩১৬, উদ্বোধন, কলিকাতা, ১২ ও ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, পৃ. ৪১
১৩. চন্দ রানী, ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ-২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯, পৃ. ১৩০
১৪. Sihota, Ramanjit and Radhika Tandon, editors. ‘Parsons’ Diseases of the Eye, 21st Edition, Elsevier, A division of Reed Elsevier India Private Limited, New Delhi, 2011, page no. 25
১৫. Sihota, Ramanjit and Radhika Tandon, editors. ‘Parsons’ Diseases of the Eye, 21st Edition, Elsevier, A division of Reed Elsevier India Private Limited, New Delhi, 2011, page no. 96
১৬. চন্দ রানী, ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ-২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯, পৃ. ১২
১৭. ভৌমিক ডা. নৃপেন ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যভাবনা’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১২ পৃ. ৭৩
১৮. চন্দ রানী, ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ-২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯, পৃ. ১৮